৩০-১১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - একে অপরকে দুঃখ দেওয়া, যা কেবল ভূত বা অসুরদেরই কাজ। তাই তোমরা মনুষ্য আত্মারা কাউকেই কোনও প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেবে না। রামরাজ্যে আদৌ রাবণের মতন ভূত-প্রেত্নী, দৈত্য-দানব, অসুরেরা থাকেই না।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, কি এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতিতেও তোমরা মোটেই হতবুদ্ধি হয়ে না পড়ে নিজেকে হাসি-খুশীতেই রাখতে পারো ?

উত্তর :- কোনও অসুখ-বিসুখ, রোগ-ভোগ হলেও তাতে হতবুদ্ধি হয়ে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। নিজেকে যদি দেহ-অভিমানে জড়িয়ে রাখো, কেবলমাত্র আত্মা ভাবতে না পারো, তবে তো সারাদিন দেহের প্রতিই লক্ষ্য থাকবে, ফলে নিজেকে প্রায় মৃতবৎ মনে হবে। তাই বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে (পরমাত্মার সাথে) যোগযুক্ত রাখতে পারলে, দেহের ব্যাথা-যন্ত্রনা অনেক কম অনুভূত হবে। এছাড়া যোগবলের দ্বারা রোগগুলির উপশমও হয়। ফলে নিজেও খুশীতে থাকতে পারবে। যেমন, কথায় আছে না - "আপনী ঘোট তো নেশা চড়ে।" (অর্থাৎ নিজের বিশেষত্বকে যত মনে করবে, ততই আনন্দে থাকতে পারবে। সেই বিশেষত্বকে বুদ্ধিতে যত বেশী মনন-চিন্তন করবে, ততই আনন্দ পাবে।) এই ভাবেই কর্ম-ভোগকেও দূর করতে হবে যোগের দ্বারা।

গীত :- (ওগো অলস মানুষেরা) তোমরা রাত অতিবাহিত করলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর দিন কাটালে কেবল খেয়ে-দেয়ে।

ওঁম্ শান্তি! এসব কথা শাস্ত্র-পুঁথিতেও তো আছে। যা একে অপরকে তা বুঝিয়েও থাকে। তবুও লোকেরা সময়ের অপচয় করা থেকে বিরত থাকে না। কত গুরুই তো কত মতামত দেয়। নামকরা ভক্তরাও গুহায় বসে, নিজেদের হাত গৌ-মুখ কাপড়ে (জপের মালা যে কাপড়ের থলেতে রেখে জপ করা হয় তাকে ভক্তরা গৌ-মুখ বলে) মালা জপতে থাকে। যা ভক্তির এক ধরণের রীতি-রেওয়াজ। কিন্তু বাবা জানাচ্ছেন, এসব রীতি-রেওয়াজ ছাড়ো। আত্মার কর্তব্য কেবলমাত্র তার পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করা। যার জন্য মালা জপার প্রয়োজন পড়ে না। সর্বোত্তম্ গীত হলো শিবায়ঃ নমঃ। এই গীতের মর্মার্থেই আছে, এই পরমাত্মাই যেমন মাতার রূপ, তেমনি উনিই আবার পিতারও রূপে। তাই তো এই পরমাত্মা ভগবানকেই বলা হয় রচয়িতা। --কিন্তু উনি কি রচনা করেন ? লোকেরা তো ভেবে থাকে উনি কেবল নতুন দুনিয়ার রচনাই করেন। তাই সেই অনুসারেই গীতও রচনা করেছে, "তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি।" কিন্তু তা কেবল তারা গেয়েই থাকে। এর মর্মার্থ বোঝে না কিছুই। যাই হোক্, ঈশ্বরের অর্থ এসে দাঁড়ালো পিতা। পিতা যখন আছে, সেক্ষেত্রে মাতা-ও তো থাকা আবশ্যক। যেহেতু মাতা ছাড়া তো কোনও কিছু সৃষ্টিই হবে না। যদিও সেটা তারাও বোঝে। কেবল এটাই তারা জানে না যে, কিভাবে সেই রচনা রচিত হয়। যদিও তা মাতা-বলা হয়, কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্র তা আবার নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্কই এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার বিকারী সম্পর্কের দৃষ্টিও আসতে পারে না। অবশ্য যখন তা আত্মা স্বরূপে চলে আসে, তখন সেক্ষেত্রে যেমন পবিত্র-অপবিত্রতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, তেমনি ভাই-বোন সম্পর্কেরও কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ফলে তখন তা ভাই-ভাই সম্পর্কেই এসে দাঁড়ায়। কি সুন্দর ভাবে এই পয়েন্টের উপর বোঝানো হলো। কিন্তু মায়া এমনই যে, তৎসত্ত্বেও সে ফট্ করে আত্মাদের গাড্ডাতেই ফেলে দেয়। যেমন বড় কোনও

ঝড়-বৃক্ষ ঝড়-তুফানে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বিশাল বট-বৃক্ষই একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। হাজার ঝড়-তুফানেও কখনই ভূ-পতিত হয় না। এটা বোঝাতে সহজ হবে। আর তাই সবাই গেয়ে থাকে, "তুমি মাতা-পিতা" - যা অনেকদিন ধরেই গেয়ে আসছে এই অতীত দিনের ভক্তি-মার্গের গীত। মাতা-পিতাই তো সৃষ্টি রচনা করেন। আমরা যখন তারই সন্তান, সেক্ষেত্রে তো আমাদের ভাগ্যে পরম-সুখই প্রাপ্য। কিন্তু এটাই স্পষ্টরূপে সেভাবে কেউ জানে না যে, উনি যেমন আমাদের মাতা-পিতা, তেমনি শিক্ষকও আবার সদগুরুও বটে। তাই তো লোকেরা এমন ভাবে ওনার মহিমা করে, "তুমিই মাতা-পিতা।" অতএব তোমরা সেক্ষেত্রে তো ভাই-বোন সম্পর্কেরই হয়ে গেলে। তবে আবার তোমরা বিকার কার্যে লিপ্ত হও কি প্রকারে ? একবার ওনার সন্তান হবার পর, সবকিছুই তো জানতে পারো তোমরা। তোমরা বি.কে.-রা যদিও ঘর-গৃহস্থেই থাকো, কিন্তু স্মরণ তো কেবল এক ও একমাত্র শিব বাবাকেই করো।

তোমরা ব্রহ্মাবাবার সন্তানেরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক। তাই তো তোমাদের বলা হয়, ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। তোমরা বি.কে.-রা ব্রহ্মার রচনা। তোমাদের মাতা-পিতাই তোমাদের সুখের ব্যবস্থা করেন। সেই অপার সুখ পাবার লক্ষ্যেই তোমরা তোমাদের মাতা-পিতার কাছ থেকে রাজযোগের শিক্ষা নিচ্ছ এখন। কিন্তু সেই পরম স্বর্গ-সুখ, যা সত্যযুগে পাওয়া যায়। যেখানে কেবল সুখ আর সুখ। একমাত্র এই বাবা যে স্বর্গের রচনা করেন। সেখানে কেবলই সুখ আর অঢেল সুখ। যখন তোমরা দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাও, একমাত্র তখনই সুখ-সাগরে যাবার এই শিক্ষা পাওয়া যায়। তখনই সেই মাতা-পিতা এসে সুখ-সাগরের দিশা দেখান। যেমন এ্যডম আর ইভের সেই বিখ্যাত কাহিনী। তারাও কিন্তু ঈশ্বরেরই সন্তান। তবে ভগবান কে ? বর্তমানের এই দুনিয়া তো ভূত-পেত্নী, দত্যি-দানব, অসুরদের রাজ্য। তবুও লোকেরা তেমন ভাবে অনুভবে আনে না যে, রাবণ কি বিষম বস্তু। এই বিকারের ভূত বর্তমানে সবার মধ্যেই আছে। যেহেতু বর্তমান জগৎ-টা তো চলছে রাবণের শাষণে। তাই এখানে কেবলমাত্র ক্রোধের ভূতই নয়, বিকার-ভূতের প্রভাবই বেশী। অর্থাৎ এখানে এখন সবাই বিকারের ভূতে আক্রান্ত। তাই তো কেউ কিছু ছাপাতে গেলে, বাবা তার প্রতি যথেষ্টই লক্ষ্য রাখেন, যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটাই যে আসুরী ভূতেদেরই। বাচ্চারা, তোমাদেরও তেমনি অন্যদের বোঝাবার সময় যুক্তিগুলির প্রতিও সেভাবেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

তোমরা তো জানো, বাবা যে জ্ঞান দেন, তা সব ধর্মের লোকেদের জন্যই। বর্তমানে সবারই বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বাবার সাথে। বিকারী ভূতেরাই বাবার সাথে সেই বুদ্ধিযোগ লাগাতে দেয় না। উপরন্তু, সামান্য যেটুকুও বা কারও লাগে, তাও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই বাবা স্বয়ং এখন এসে সেইসব আগ্রহী বাচ্চাদেরকে এমন ভাবে তৈয়ারী করেন, যাতে অতি সহজেই সেই বিকাররূপী ভূতকে পরাজিত করতে পারে। আজকাল তো দুনিয়ায় আবার রিদ্ধি-সিদ্ধির লোকেদের রমরমা। তাদের ক্রিয়া-কলাপে তারাও এই দুনিয়ায় একে অপরকে দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই যে বিকারী-ভূতেদের দুনিয়া। তাই কামরূপী বিকারের কারণেই একে অন্যকে শুরু থেকে শেষ (আদি-মধ্য-অন্ত) পর্যন্ত কেবল দুঃখই দিতে থাকে। এই একে অপরকে দুঃখ দেওয়াটা- যা কেবল ভূতেদেরই কাজ। এই কাম-বিকারের ভূত, যা সত্যযুগে থাকে না। এই 'ভূত' শব্দের প্রচলন শুরু হয়েছে বাইবেলের যুগ থেকে। ভূত অর্থে রাবণ। রামরাজ্যে ভূতের কোনও অস্তিত্বই নেই। সেখানে কেবলই আনন্দের জয়-জয়কার ধ্বনির আওয়াজ। তা যে অপার সুখের রাজ্য। "শিবায়ঃ নমঃ" - এই গীতও কিন্তু খুবই সুন্দর। প্রকৃত অর্থে এই শিববাবাই সবার মাতা-পিতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-

শংকরকে কিন্তু মাতা-পিতা বলা চলে না। কেবলমাত্র এক শিব-কেই প্রকৃত বাবা বা পিতা বলা চলে। আর এ্যডম্ ও ইভের পার্টধারী অর্থাৎ ব্রহ্মা-সরস্বতী, ওনারা তো এই দুনিয়াতেই জন্ম নেন। তারাও তো সেই শিববাবার নিকটেই -"ও ঈশ্বরীয় পিতা" - এমনই বলে প্রর্থনা করেন। এই ভারতবর্ষই সেই মাতা-পিতার জন্মভূমি। ওনাদের জন্ম এই ভারতেই। তাই সবাইকে বোঝাতে হবে, তোমরা যে মাতা-পিতার বন্দনা করো, প্রকৃত অর্থে তারা কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ও তোমাদের এবং ব্রহ্মার সাথেও পবিত্র ভাই-বোন সম্পর্কের। যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মা স্বয়ং তোমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। তাই তো এত বিশাল সংখ্যক ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হতে পেরেছো তোমরা। প্রকৃত অর্থে নেপথ্যে শিববাবাই কিন্তু ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের দত্তক করান। যেহেতু এই নিমিত্ত ব্রহ্মার সাহায্যেই যে আবার নতুন দুনিয়ার রচনা হবে। বোঝাবার জন্য এমন অনেক যুক্তিই আছে। কিন্তু সেসব সম্পূর্ণরূপে তোমরা বোঝাতে পারো না। যেমন, বাবা তো অনেক বারই তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন -এই "শিবায়ঃ নমঃ" গীত বাজিয়ে সর্বত্রই এর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে বোঝাও। কি করে উনি আমাদের যেমন মাতার-স্বরূপ তেমনি আবার পিতা-স্বরূপও, ফলে তোমরা ওনারও সন্তান-স্বরূপ। এখানে বসে বসে বাবা বাচ্চাদেরকে এসব কথাই বোঝাতে থাকেন। পূর্বেও (গত কল্পেও) এভাবেই ব্রহ্মার দ্বারাই নতুন দুনিয়া স্থাপিত হয়েছিলো। যেহেতু এখন কলিযুগের অন্তিম-ক্ষণ, তাই আবারও সেই নতুন দুনিয়া স্থাপনার কাজ চলছে। এই ধারণা তোমাদের বুদ্ধিতে খুব সুন্দর ভাবে ধারণ করতে হবে। এই জ্ঞানও অতি সহজ ও সরল।

মায়ার তুফান তোমাদেরকে বাবার সাথে যোগে একাগ্র হতে দেয় না। তোমাদের বুদ্ধি কেবলই এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। তা না হলে অন্যদেরকে খুব ভালভাবে বোঝাতে অনেক সহজ কাজ হতো তোমাদের। সর্বাগ্রে বোঝাতে হবে রচয়িতা কেবলমাত্র একজনই - যাকে সবাই বাবা বলেই জানি। যিনি নিরাকার, জন্ম-মৃত্যু রহিত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের সূক্ষ্ম দেহ আছে। ৮৪-জন্মের ভোগ কেবল মানুষদেরই হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম বতনে যারা থাকে, তাদের সেই ভোগ ভুগতে হয় না। তোমরা এও জানো যে, তোমরা এই মাতা-পিতার নতুন বাচ্চারা, যাদের এই (ব্রহ্মা) বাবা দত্তক নিয়েছেন। তাই তো ব্রহ্মার এত অসংখ্য বাহু দেখানো হয়। অন্যেরা এসবের প্রকৃত অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। কারণ যেসব চিত্র ইত্যাদি প্রচলিত আছে, তা সবই তো অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের মস্তিষ্ক প্রসূত। যদিও তা অবশ্য অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই। পূর্বের অর্দ্ধকল্প ছিল জ্ঞান-মার্গ বা ব্রহ্মার দিন, আর তার পরের অর্দ্ধকল্প হয় অন্ধকারময় ভক্তি-মার্গের, যা এখনও চলছে। একমাত্র এই বাবা এসেই তোমাদেরকে এই রাজযোগের শিক্ষা দেন। যা সর্বদাই তোমাদের স্মৃতিতে থাকা উচিত। যেমন বলা হয়ে থাকে - "আপনী ঘোট তো নেশা চড়ে" (নিজের বিশেষতা-গুলিকে যত স্মরণ করতে থাকবে, ততই উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে, নিজের বুদ্ধিতে যতই তা মনন-চিন্তন করতে থাকবে ততই তাতে নেশা আরও বাড়তে থাকবে।) তবে বুদ্ধিকে বাবার সাথে যোগে রাখতে হবে। কিন্তু এখানেও অনেকেরই বুদ্ধিযোগ এদিক-ওদিক ফেঁসে আছে। পুরোনো দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিদের সাথে দেহ-অভিমানে ফেঁসে আছে অনেকেই। তাই তো সামান্য অসুখ-বিসুখ হলেই, যেন মরে গেলো, এমন ভাবই করে অনেকেই। আরে, যোগে থাকলে তো তোমাদের ব্যাথা-যন্ত্রনাও কম হয়ে যাবে। যোগে থাকতে না পারলে, রোগ কমবেই বা কি প্রকারে ? একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই যে মাতা-পিতা, পূর্বে এনারাই সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন, এখন আবার এনারাই সবার আগে পতিত হয়েছেন। ওনাদেরকেও নিজের নিজের কর্মফলের ভোগ যথেষ্টই ভুগতে হয় ওনাদেরও। কিন্তু, যেহেতু ওনারা যোগযুক্ত হয়ে থাকতে পারেন, তাই ওনাদের রোগ-শোক, অসুখ-বিসুখ সবই দূর হয়ে যায়।

তা না হলে, হিসেব মতন ওনাদের রোগ-ভোগ সব চাইতে বেশী। কিন্তু যোগবলের সাহায্যে ওনাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়, ফলে ওনারা খুবই হাসি-খুশীতেই থাকতে পারেন।

এই বাবার থেকেই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের পরম সুখ পেয়ে থাকো। এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা রোগ-ভোগের কারণে একেবারেই কাতর হয়ে যায় বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সুস্থ যেন আর হতেই চায় না। তা দেখে অনায়াসে বোঝা যায় যে, সে দেহ-অভিমানে অবশ্যই ফেঁসে আছে। ফলে নিজেদেরকে আত্মা-স্বরূপ ভাবতেই পারে না। সারাদিন কেবল নিজের দেহের প্রতিই লক্ষ্য রাখে। এই ধরণের আত্মারাই মৃতবৎ-প্রায়। বাবা এসে এইসব আত্মাদের এমন ভাবে জ্ঞানের আলোয় জাগিয়ে তোলেন, ঠিক যেমন কারওকে কবর থেকে উঠিয়ে জ্যান্ত করে দেওয়া। এরপর তাকে আবার জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে চাঙ্গাও করে দেন। তোমাদেরকেও তেমনি জ্ঞানের বুলবুলি (পাখী) হতে হবে। এক্ষেত্রে ছোট-ছোট কুমারী-বাচ্চারাই বেশী প্রাণবন্ত! বাচ্চাদের চাল-চলনই বলে দেয় তাদের মাতা-পিতার সংস্কার। যেমন লোক-পরলোক-দেবলোক হয়, তেমনি লোকেরাও তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে, এইসব ছোট-ছোট কুমারী বি.কে.-রা মাতা-পিতাদেরও কি সুন্দর ভাবে জ্ঞানের ধারণা শোনাচ্ছে। বাস্তবে এইসব কুমারীরাই প্রকৃত মান-সম্মানের অধিকারী। তাই তো ভক্তি-মার্গের লোকেরাও কুমারী-পূজাও করে থাকে। শিব-শক্তি সেনা অর্থাৎ সবই কুমারী। যদিও তার মধ্যে মাতা-রাও আছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাকে তো নারী-শক্তিই বলা হয়। ব্যাপারটা একই। ছোটরাই বড়দের পরিচয় বহন করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার খুব সুশীল কন্যাও আছে। কিন্তু মোহ-ই তাদের সবকিছু ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোহ ব্যাপারটা এমনই খারাপ। যা একবার ধরলে মানুষকেও বান্দর-বান্দরী বানিয়ে ছাড়ে। তোমরা তো জানো, বান্দরীদের মধ্যে কি ভয়ানক মোহের আকাঙ্খা থাকে। আর তা হয় মোহরূপী ভয়ানক বিকার রূপী ভূতের জন্য। বাবার কাছ থেকেও অন্য দিকে টেনে নিয়ে যায় অনায়াসেই। ঠিক এই কারণেই তোমাদের উচিত মাতা-পিতাকে স্মরণ করা (ফলো করা)। লোকেরা মন্দিরে যে রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি ও চিত্র দেখায়, বাস্তবে গীতাতে কিন্তু কৃষ্ণের সাথে রাধার নাম নেই কোথাও। কৃষ্ণের গুণা-গুণ মহিমা তো সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। উনি (কৃষ্ণ) সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ। আবার পরমাত্মার গুণ ও মহিমা তাও সম্পূর্ণই পৃথক, কিন্তু যা সর্বাধিক উন্নত ও সম্পূর্ণ পৃথক। তাই তো শিবের আরতী করার সময়, সেই বিশেষ মহিমাগুলির এত কীর্তণ করা হয়। যদিও লোকেরা সেগুলির অর্থ বা মর্মার্থ কিছুই বোঝে না। আর এভাবেই বহুযুগ ধরে পূজো করতে করতে মানুষেরা এখন হাঁপিয়ে উঠেছে।

এখন তো তোমরা বুঝতেই পারছ, মাম্মা-বাবা (ব্রহ্মা বাবা আর মাম্মা) আর তোমরা ব্রাহ্মণেরাই সব চাইতে বেশী ভক্তি করেছো এবং পূজারীও প্রথমেই হয়েছো। এখন আবার সেই তোমরাই বি.কে.ব্রাহ্মণ হয়েছো। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তোমরাই সর্বোত্তম। কর্মভোগ তো সবাইকেই ভুগতে হয়। কিন্তু যোগবলের দ্বারা তাকে আবার দূরও করতে হবে। যার জন্য সর্বাগ্রে দরকার দেহ-অভিমান ভাবকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া - আর বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজেকে খুব খুশীতে আর আনন্দে রাখা। মাতা-পিতার থেকেই তো আমরা পরম সুখ পেয়ে থাকি। শিববাবার জ্ঞান-সম্পদের আশীর্বাদী-বর্সাও পেয়ে থাকি (ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে)। (ব্রহ্মা বাবা বলছেন) - এই বাবা (শিববাবা) আমার শরীর রূপী রথকে আধার করেছেন। তাই এই রথের প্রতি শিববাবা অবশ্যই বিশেষ যত্নবান। ব্রহ্মাবাবা প্রথমদিকে ভাবতেন, তিনি আত্মা, আর এই শরীর রূপী রথকে উনি নিজেই ভরণ-পোষণ করেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মাবাবাই এখন আবার বলছেন, ব্রহ্মার এই শরীরকে স্বয়ং

শিববাবা তার ভরণ-পোষণ করছেন। ব্যাপারটা এমন এসে দাঁড়ালো যে, উভয়েই উভয়ের ভরণ-পোষণ করছেন। শিববাবা আরও জানাচ্ছেন, "ব্রহ্মার অনেক জন্মের পরে এই অন্তিম জন্মে বাবা স্বয়ং ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন- যা ব্রহ্মা তার নিজের এই জন্ম-বৃত্তান্ত জানে না, অথচ আমি কিন্তু সবই জানি।" আর তাই তো তোমরা বাচ্চারাও ব্রহ্মার মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করে অন্যদেরকেও বলতে পারো, পূর্বের ন্যায় এখনও আবার শিববাবা স্বয়ং জ্ঞান-রত্নে ধনী বানাচ্ছেন তোমাদেরকে। এই ব্রহ্মার মাধ্যমেই শিববাবা ওনার আশীর্বাদী-বর্সা দিচ্ছেন তার বাচ্চাদেরকে। যে আশীর্বাদী-বর্সা সত্যযুগের জন্য। সত্যযুগে রাজা-প্রজা সবারই একই রকম অবস্থা। অতএব, তোমাদেরকেও সেভাবে পুরুষার্থ করে বাবার সেই সম্পত্তির অধিকার পুরোপুরি নিতে হবে। আর এখন যদি তা না নিতে পারো, তবে আগামীতে কল্প-কল্প ধরে বার বারই তার থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে। আর কখনই কোনও সময় এত উচ্চ-পদাধিকারী হতে পারবে না। এটাই যে জন্ম-জন্মান্তরের শর্ত। অতএব নিজেরাই তা ভেবে নাও, কতটা নিষ্ঠা-সহকারে শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। এক জন্মের এই জ্ঞানের পাঠ যে, কল্প-কল্প ধরে অনেক কল্পের জন্য। তাই তো এর প্রতি খুবই মনোযোগ দিতে হয়। সাত-দিনের প্রাথমিক পাঠ নেবার পর তারপরে মুরলী নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েও তা অধ্যায়ন করতে পারো। আমেরিকা বা অন্যত্র কোথাও যেতে হলে তা তো যাবেই, কিন্তু সেখানে গিয়েও তোমরা বাবার আশীর্বাদী-বর্সা অনায়াসেই পেতে পারো এই মুরলী অধ্যায়নের মাধ্যমে। কিন্তু সর্বাগ্রে শুরুর সাত-দিনের প্রাথমিক কোর্স-টা অবশ্যই মনের গভীরে ধারণ করতে হবে। খাওয়া-দাওয়াতে একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে, যা তোমরা সহজেই তা খাদ্য হিসাবে গ্রহন করতে পারো। যেমন, পাউরুটিতে মোরব্বা, (জ্যাম/জেলী) ইত্যাদি লাগিয়েও খেতে পারো। ধীরে ধীরে ওটাই স্বভাবসিদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। এরপর অন্য কোনও কিছুই আর ভাল লাগবে না। তোমরা সবাই নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক। যেহেতু তোমরা সবাই একই ব্রহ্মাবাবার সন্তান। অতএব তা তো ভাই-বোন সম্পর্কই হলো। সংসার-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকেই ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ক বজায় রাখতে পারলেই তো সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারবে। যদিও তা কোনও কঠিন ব্যাপার নয় মোটেই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ও ভালবাসাসহ সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানের বুলবুলি হয়ে ধীরে-সুস্থে মিষ্টি মিষ্টি করে জ্ঞান শুনিয়ে সবাইকে তাদের অজ্ঞানতার কবর থেকে বের করে আনতে হবে। দৈবী মাতা-পিতার সন্তান হিসাবে নিজেকে প্রমাণ দিতে হবে।

২) নিজের সংস্কারের মধ্যে কোনও প্রকারের বিকারের ভূতকে প্রবেশ করতে দেওয়া চলবে না। মোহের ভূতও সর্বনাশ করে দেয়। এই কারণে মোহ-র ভূতের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেই হবে। এক ও একমাত্র বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগে সংযুক্ত থাকতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, ফরিস্তা থেকে জীবন-মুক্ত অর্থাৎ দেবতা হওয়ার যোগ্য সর্ব-আকর্ষণ মুক্ত হও

বিস্তার :- এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই ব্রাহ্মণদের ফরিস্তা হতে হবে। ফরিস্তার অর্থ- যার এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো সংস্কার ও পুরানো দেহের প্রতি কোনই আকর্ষণ বা সম্বন্ধ-সম্পর্ক একেবারেই থাকে না। এই তিন থেকে মুক্ত থাকতে পারার জন্য ড্রামা অনুসারে প্রথমে মুক্তির আশীর্বাদী-বর্সা ও তারপরে জীবন-মুক্তির আশীর্বাদী-বর্সা লাভ হয়। অতএব, ফরিস্তা অর্থাৎ মুক্ত এবং মুক্ত ফরিস্তাই জীবনমুক্ত হয়ে দেবতা হয়। যখন এই প্রকারের ব্রাহ্মণ, যে সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ফরিস্তা হয়, সেই দেবতা হতে পারে। তখন প্রকৃতিও মনে-প্রাণে হৃদয় আর ভালবাসা দিয়ে তার সেবা করে।

স্লোগান :- নিজের সংস্কারগুলিকে সহজ-সরল করে নিলে সব কার্যই সহজ-সরল হয়ে যায়।